আপন ছায়া

একগুচ্ছ অগ্রন্থিত গদ্য

আবুল হাসান

ঐতিহ্য

কবি আবুল হাসান (১৯৪৭-৭৫) আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী সম্পাদিত *দৈনিক জনপদ* পত্রিকায় (প্রথম প্রকাশ : ২৪ জানুয়ারি ১৯৭৩) সহকারী সম্পাদক হিসেবে ১৯৭৩ সালে চাকরিতে যোগদান করে ১৯৭৪ সালের জুন পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। মূলত *জনপদ* পত্রিকায় কর্মরত আবুল হাসান 'আপন ছায়া' এবং 'খোলাশব্দে কেনাকাটা' (ভ্রামণিক ছদ্মনামে) শিরোনামে দুটি উপসম্পাদীয় কলাম লিখতেন।

১৯৭৪ সালের জুনের শেষার্ধে তিনি আল মাহমুদ সম্পাদিত দৈনিক গণকণ্ঠে সহসম্পাদক হিসেবে যোগ দিয়ে নভেম্বর ১৯৭৪ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। এই পত্রিকায় তিনি 'আড়ালে অন্তরালে' এবং 'বৈরী বর্তমান' শিরোনামে পৃথক দুটি উপসম্পাদকীয় কলাম লিখতেন। বর্তমান বইয়ে আবুল হাসানের এ-সকল উপসম্পাদকীয় রচনা সংকলিত হলো। সেই সঙ্গে 'ফসল বিলাসী হাওয়ার জন্য কিছু ধান চাই' শীর্ষক একটি উপসম্পাদকীয় নিবন্ধ এবং দৈনিক জনপদে প্রকাশিত তাঁর চারটি প্রবন্ধ সংকলিত হলো।

অধিকাংশ রচনার 'আপন ছায়া' শিরোনামে রচিত বলে এই নামেই বইয়ের নামকরণ করা হলো। এখন পর্যন্ত অগ্রন্থিত আবুল হাসানের এই গদ্যগুচ্ছে তাঁর সাহিত্য-মানসের পাশাপাশি সমাজ-রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার প্রকাশ ঘটেছে।

সূচি

প্রবন্ধ

সেই মুক্তিযুদ্ধ, সেই কবিতা ১১
যুবরাজ যখন কবি যুবরাজ তখন বিদ্রোহী ২০
বারবার ব্যবহৃত সন্ধিৎসা ২৪
অন্যরা যা বলে বলুক ২৮

উপসম্পাদকীয় রচনা

আপন ছায়া ৩৫
আড়ালে অন্তরালে ৮৭
খোলাশব্দে কেনাকাটা ৯৯
ফসলবিলাসী হাওয়ার জন্য কিছু ধান চাই ১২১
বৈরী বর্তমান ১২৯

প্রবন্ধ

সেই মুক্তিযুদ্ধ, সেই কবিতা

যেকোনো দেশের কবিতা, সে ইংরেজিই হোক, সে ফরাসিই হোক, কিংবা বাংলাই হোক;— সে তার নিজস্ব পরিমণ্ডলের প্রভাবে প্রভাবিত হতে বাধ্য। একটি দেশের একটি বিরাট রকমের মানসিক লাবণ্যের স্মারকচিহ্ন হচ্ছে সেই দেশের সাহিত্য-শিল্প তথা কবিতাও। পরিবেশের প্রভাবে সেই কবিতা বারবার চেহারা বদল করে। কখনো বিপ্লব এসে তাকে বলীয়ান শব্দসম্ভার উপহার দিয়ে যায়। কখনো রাজনীতির অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা তাকে ব্যথিত আঁধারের বর্ণমালা করে। কখনো দুর্ভিক্ষে সে দীন, প্লাবনে সে প্রলয়চিহ্নগত। কখনো আবার মহামারির মৌলিক জরার আঁচড়ে আচমকা কেঁপে ওঠে তার শরীর। এক একবার এক এক রকম পরিস্থিতির উদ্ভব হয় আর সেই পরিস্থিতির বীজ ভেঙে নতুন চারার মতো নতুন পাতা এবং শিকড় জড়িয়ে বেরিয়ে আসে নতুন ধরনের কবিতা। বাংলাদেশেও এই রকম সাতপাঁচ পরিস্থিতির হরহামেশা আবহাওয়ায় কবিতার স্বভাব থেকে শুরু করে তার ভাষা ব্যবহার, প্রকরণগত শৈলী এবং আঙ্গিক-প্রকরণও পাল্টে গেছে বারবার। কখনো সেই কবিতায় রাজনৈতিক শোষণ থেকে বেরিয়ে আসার বিদ্রোহী চিহ্ন পড়েছে। কখনো কম্পমান কৃষ্টির দুর্ভিক্ষ তাকে দীনতায় আচ্ছন্ন করার সঞ্চারে হয়েছে উজ্জীবিত।

এখন প্রশ্ন, বাংলাদেশের এইসব অন্যান্য আন্দোলিত প্রেক্ষিতের মতো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাংলা কবিতার এই উজ্জীবন কতটা ফলপ্রসূ হতে পেরেছে? কতটা তির্যক এবং ভিন্নধর্মী হয়েছে তার ভাষা ব্যবহার? বাংলাদেশের ক'জন কবি-সাহিত্যিক-লেখক-শিল্পী মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন? কেউই নন। সমরসমস্যা কাটিয়ে ওঠার দীর্ঘ মানস প্রস্তুতির আগেই সৌভাগ্যবশত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল।

২৫শে মার্চের কালরাত্রির ভয়াবহতার পরে সেই ন'মাসের ভিতরে কিছু কিছু লেখক এবং কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক বাংলাদেশের সীমান্ত পার হতে পেরেছিলেন। কলকাতায় তারা সমবেত হয়েছিলেন। সেখানে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র নামক বেতারযন্ত্রও স্থাপিত হয়েছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একমাত্র অনুপ্রেরণাস্বরূপ তখন কিছু নতুন ধরনের সংগ্রামী গান আমরা বেতারমাধ্যমে শুনতে পেতাম। মাঝে মাঝে কিছু নতুন ধরনের সংগ্রামী কবিতাও– যাতে স্টেনগান থেকে শুরু করে মর্টারের বর্ণনা থাকত। সেইসব স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রাদির কলাকৌশল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জনপূর্বক ঐ ধরনের কবিতা লেখা হয়েছিল বলেই হয়তো তাতে নতুন ধরনের আবহাওয়া ও উজ্জ্বল উদ্ধারের আমেজ প্রকাশ পেয়েছিল। অবশ্য সেইসব কবিতার রচয়িতা যেহেতু প্রতিষ্ঠিত অর্থে আগে থেকেই কোনো নামকরা কবি-সাহিত্যিক হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেননি, ফলে মুক্তিযুদ্ধের পরে সেইসব কবিতা আমাদের লোকচক্ষুর অগোচরে রয়ে গেছে। আর সেই সময়ে যারা যুদ্ধকবলিত স্বদেশের বিবর্ণ পরিবেশের সাক্ষী হিসেবে রয়ে গেলেন, স্বভাবতই তাদের চোখ-মুখ, তাদের হৃদয় সম্পূর্ণ আতঙ্কিত তখন। তাদের আত্মায় তখন যুদ্ধের ক্ষমাহীন হিংস্র নৈঃশব্দতা বিরাজমান। তাদের উল্লেখযোগ্য কলমের ডগায় তখন এক ধরনের নিরাশ স্তব্ধতার ভাষা বিরাজমান। ভিতরে ভিতরে অবশ্য সেই সব স্থিরতার অকূল মানসপ্রবাহের তরঙ্গ এসে মুহুর্মুহু আঘাত দিচ্ছিল প্রত্যেক সচেতন কবিকেই। যেসব কবি-সাহিত্যিক ভারতে পালিয়ে যেতে পেরেছিলেন তারা স্বভাবতই আমাদের এখানকার সেই ভয়াবহ স্তব্ধতার, তৎকালীন নৈরাশ্যের অভিজ্ঞতা অর্জন করেননি। সুতরাং তারা যা লিখেছেন তা তখনকার সময়ের সত্যিকার প্রতিবিম্ব না হয়ে বরং অন্যরকম হয়েছে। আবার এখানেও যা লেখা হয়েছে এবং পরে যা পুস্তকাকারে অথবা পত্রপত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছে তাও যথেষ্ট পরিমাণ তির্যক এবং শক্তিশালী হতে পারেনি। যে অর্থে তির্যক এবং শক্তিশালী ভাষার ক্ষমতা অর্জন করেছিল একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনের পরবর্তী কবিতা। বাংলার কবিতার অন্যতম কণ্ঠস্বর শামসুর রাহমানের যুদ্ধসময়ের রচিত কিছু কিছু কবিতা বাদ দিলে তারও কবিতা মনে হয়েছে বানিয়ে তোলা সংবাদ ভাষ্য। ভাষার বিবর্তন হয়েছে কেবল বস্তু বর্ণনার কিন্তু ভিতরের অন্তঃশীল সত্তাটি রয়ে গেছে একেবারে নিরিবিলি, একেবারে সরল। যা কোনো যুদ্ধ সময়ের হিংস্রতার সত্যিকার সাক্ষী হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। সেই সময়ের বিপদগ্রস্ততার কোনো চিহ্নমাত্র, কোনো ছায়ামাত্র তীব্রভাবে তার কবিতায় আমার মনে হয় আশ্রয় পায়নি। কেবল সেই সব দুর্দিনের ভাষা সংবাদের মতো স্থান পেয়েছে

তাতে— এ বৈ শিল্পক্ষমতায় আমাদের অধীত অভিজ্ঞতার শ্রদ্ধা তার কবিতা পেতে পারে না। তার এইসব কবিতার সঙ্গে সমানভাবে আমাদের তৎকালীন হিংস্র দুর্দিনের প্রখর স্তব্ধতা, সেই সব আত্মগত অপমান; সেই সব পরিস্থিতির খল ছদ্মবেশও যুক্ত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু হয়নি; কারণ তিনি দিনযাপন মেপে যদিও তখন কবিতা লিখেছেন, সেটা শত হলেও সুরক্ষিত আধারের ভিতর বসে বসে লেখা। প্রত্যক্ষ অনুভূতির উদার সঞ্চয় নয়। এও হতে পারে, সেই সময়ে হয়তো তার এইসব কবিতা লেখার মানসিক প্রস্তুতি প্রাপ্তবয়স্কতা অর্জন করেনি। কেননা তার আগেই প্রথাগতভাবে এবং অলৌকিকভাবেই আমাদের মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয়েছিল। ফলে সেই যুদ্ধের তরঙ্গ যতটুকু দুরন্ত অভিঘাতরাশি এনেছিল কবিদের মানসিক গভীরতায়, তাতে সার্থক কবিতাপ্রতিমা নির্মাণের যথাসম্ভব পলি জমে উঠতে পারেনি এবং সেই সব কবিতার শরীর শিল্পনৈপুণ্যে, সৎ শব্দপ্রজ্ঞার অলংকারে রয়ে গেছে অসমাপ্ত। বরং যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, যারা সেই সম্মুখযুদ্ধের অভিজ্ঞতার অংশীদার– তাদের মধ্য থেকে মাঝে মাঝে বন্দুকের ব্যারেল থেকে বেরিয়ে আসা বুলেটের মতো তীব্রগতিসম্পন্ন তির্যক হিংস্রতাসম্পন্ন শব্দমালা ছুটে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল। কিন্তু যেহেতু শব্দের বাক্‌প্রতিমা নির্মাণের জন্যে আগে থেকেই কুশলী হওয়া প্রয়োজন; তারা তাদের অনভিজ্ঞ কলমের ছায়ায়, তাদের সেই সময়ের তাঁবুতে বসে সেই শিল্পের শব্দকৌশল আয়ত্তে আনতে পারেননি। ফলে তাদের কবিতা যতটা অভিজ্ঞতার সৎ প্রকাশ হয়েছে ততটা কবিতা হয়ে উঠতে পারেনি। এই দ্বিরায়তনিক দ্বন্দ্বযুদ্ধের সমস্যায় আমাদের মুক্তিযুদ্ধকালীন কবিতাই বেশি আহত হয়েছে। তার আত্মা হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত। তার ভাষা আমাদের কবিদের হাতে সেইভাবে বদলেছে, যেভাবে একজন প্রতিষ্ঠিত ঝানু মুনাফালোভী ব্যবসায়ী তার দোকানের, তার কোম্পানির নেমপ্লেট বদলে দিয়েছেন। এই বদলানোর ভিতরে অভ্যন্তরীণ প্রস্তুতির সততা যতটুক না প্রদর্শিত, তার চেয়ে বেশি প্রদর্শিত হয়েছে নিজের কবিত্বের শ্রেষ্ঠতাকে রক্ষণ করার তথাকথিত অভিলাষ। ফলে কবিরা যা লিখেছেন তা তৎকালীন অবস্থার সঠিক দর্পণ হয়নি। হয়েছে প্রার্থনামূলক শ্লোক। বরং ২৫শে মার্চের সেই আচমকা ক্র্যাকডাউনের, সেই খাকি বর্বরতার আর্ত-অস্থির উদ্‌ভ্রান্তির সম্মুখে আমাদের কবিদের মধ্যে যারা হঠাৎ থমকে গিয়েছিলেন সাধারণ মানুষের মতো; সেই থমকানোর প্রবল বস্তুনিশ্চুপ স্তব্ধতার স্মারকচিহ্ন রয়েছে তৎসময়ে রচিত কিছু কিছু কবিতায়। বোধকরি সেই সময়ের সেই হিংস্র ধ্বংসের সম্পূর্ণ ভীতির চিহ্ন রয়েছে শহীদ কাদরীর 'নিষিদ্ধ জার্নাল' নামক কবিতায়—

ভোরের আলো এসে পড়েছে ধ্বংসস্তূপের উপর
রেস্তোরাঁ থেকে যে ছেলেটা রোজ
প্রাতঃরাশ সাজিয়ে দিত আমার টেবিলে
তেরাস্তার মোড়ে তাকে দেখলাম শুয়ে আছে
রক্তাপ্লুত শার্ট পরে।
বন্ধুর সরে যাওয়ার রাস্তায়
ডি আইটি মার্কেটের ভস্মস্তূপ।
প্রতিরোধের চিহ্ন নিয়ে বিবর্ণ
রাজধানী দাঁড়িয়ে রয়েছে
তার বিশাল করিডোর শূন্য।
শহর ছেড়ে চলে যাবে সবাই
এবং চলে যাচ্ছে দলে দলে
কিন্তু এই ধ্বংসস্তূপ স্পর্শ করে
আমরা কয়েকজন আজীবন রয়ে যাব বিদীর্ণ স্বদেশে,
স্বজনের লাশের আশেপাশে তাই তার দেখা পাব বলে
দানবের মতো খাকি ট্রাকের
অনুর্বর উল্লাস উপেক্ষা করে
বিশ্বস্ত ব্যারিকেডের
পাশ ঘেঁষে
বেরিয়েছি ২৭শে মার্চের সকালে
কান্নাকে কেন্দ্রীভূত করে
পৃথিবীর প্রাচীনতম শিলায়,
যে শিলা অন্তিম প্রতিজ্ঞায় অন্তত
প্রাথমিক অস্ত্র হতে জানে॥

এই প্রাথমিক অস্ত্র ধারণের শুরু হয়েছিল ২৫শে মার্চের পর। সেই দগদগে শূন্যতার মধ্যেও কবি...

মধ্য দুপুরে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে
একটা তন্ময় বালক
কাচ, লোহা, টুকরো ইট
বিদীর্ণ কড়িকাঠ।
এক ফালি টিন।
ছেঁড়া চট, জংধরা পেরেক জড়ো
করলো
এক নিপুণ ঐন্দ্রজালিকের মতো—
এবং অসতর্ক হাতে কারফ্যু
শুরু হওয়ার আগেই
প্রায় অন্যমনস্কভাবে তৈরি করলো
কয়েকটি অক্ষর

স্বা-ধী-ন-তা।

কবি আল মাহমুদ তখন কোলকাতায়। তিনি ওখানে বসে কী লিখেছিলেন, তা অজ্ঞাত। মুক্তিযুদ্ধের পরে অবশ্য তিনি যে কবিতা লিখেছেন, সেই কবিতায় যুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই— তবু লালিত্যভেদী 'ক্যামোফ্লেজ' এই নামে শব্দে তিনি যে কবিতা লিখেছিলেন পরে সেই কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল বাংলাদেশের কোনো এক সংকলনে। যুদ্ধ সময়ের যাবতীয় খুঁটিনাটির বর্ণনা না থাকলেও, সেই সময়কার হিংস্র পরিবেশের ছায়া না পড়লেও কবিতাটি প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে তার শিল্পক্ষমতায়।

এশিয়ার মানচিত্রে বাঁচাও বাঁচাও বলে সত্যিই তো তখন বাংলাদেশ এবং তার নিসর্গ, তার নিয়মসুদ্ধ কেঁপে উঠেছিল। ফজল শাহাবুদ্দিনের 'এপ্রিলের একটি দিন ১৯৭১' কবিতায় সেই সময়ের সরল বর্ণনা স্থান পেয়েছে।

মাথার উপরে ওড়ে খুনি এরোপ্লেন
কুষ্টিয়ায় বোমা ফেলে
বোমা পড়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জুড়ে, নবীনগরের
মেঘনায় গাঙচিলে
এল, এম, জি, স্টেন, আর মর্টারের
ভয়ংকর শব্দ বেয়ে আসে অহরহ
বাংলাদেশ মিছিলের মতো বারবার কেঁপে ওঠে
নির্মম বুলেট বিদ্ধ, বেয়োনেট ছিন্নভিন্ন
আমরা সবাই নিমজ্জিত প্রেতলোক,
কখন উঠবে বেজে মৃত্যুঘণ্টা অকস্মাৎ কেউ
আমরা এখন জানি না তা।

কিন্তু কোনো ভয়াবহ, অনিবার্যভাবে কোনো হিংস্র পরিবেশের বর্ণনা এ ধরনের সরল বর্ণমালায় বিধৃত কি? ইতিহাসের একটা উপরিতল বর্ণনার মতো এই কবিতা। ঐতিহাসিক মূল্য এর থাকলেও শৈল্পিক মূল্য নেই। এর ভাষার বিবর্তন ঘটেছে শব্দে। কিন্তু আঙ্গিকে নয়। প্রবহমান অপরাপর সাধারণ বাংলা কবিতার ভেতর এ কবিতাও এক ধরনের আপৎকালীয় সংবাদভাষ্য মাত্র।

কবিদের মধ্যে কেউ কেউ যে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেননি, তা নয়, তারা অপেক্ষাকৃত তরুণ। মূলত ষাট দশকের কবি তারা। এর মধ্যে একমাত্র রফিক আজাদই বোধ হয় মুক্তিযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর 'একজন মুক্তিযোদ্ধার আত্মসমর্পণ' নামক একটি কবিতা লিখেছিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি মূলগতভাবে রোমান্টিক বিষাদাচ্ছন্ন কবিতার কলম পেয়েছিলেন, ফলে সেই কলমে তার মুক্তিযুদ্ধকালীন কবিতা তেমন উতরায়নি। যুদ্ধের পর ফিরে

আসার সঙ্গে সৈনিকের বুকে যে অভিমান পাতলা ছায়া বিস্তার করে, সেই অভিমানের ফলশ্রুতিই তার এই কবিতা :

আমার লোভ ছিল
মুক্ত বাংলায় আবার তোমার
নূপুরের নিক্বণ শুনবো
তোমার সঙ্গে জড়াবো নিজের
ভাগ্যকে;
আমার পেছনে ঘুরবে লেজনেড়ে
অর্থ খ্যাতি প্রতিপত্তি
যেমন ঘুরতো প্রাক্তন প্রভুর
পায়ে পায়ে দালাল কুকুর ।
তোমার মুখে হাসি ফোটাতে,
দামি অলংকারে সাজাতে–
ভীরু কাপুরুষ তোমার প্রেমিক
এই আমাকে
ধরতে হলে । শক্ত হাতে মর্টার,
মেশিনগান—
শত্রুর বাঙ্কারে, ছাউনিতে ছুড়তে
হলো গ্রেনেড ।
আমার লোভ আমাকে কাপুরুষ
হতে দেয়নি ।
তুমি জানতে
নিদারুণভাবে কাপুরুষ আমি
কোনোদিন পুরোপুরি তোমাকে
দেখার সাহস হয়নি,
তোমার সামনে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে
পারিনি–
উরুদ্বয় দুর্বল ছিলো;
স্পষ্ট করে কোনো কথা
বোলতে পারিনি–
ঠোঁটজোড়া কাঁপতো সর্বদা ।
কেবল তোমার দুরবস্থা দেখে
উরুদ্বয় শক্তিমান হলো—

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক কবিতা অনেকেই লিখেছেন । কিন্তু যারা শিল্প দক্ষতায় উতরে যেতে পেরেছেন তার মধ্যে অন্যতম হুমায়ুন কবির । তার ভাই মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল । এমনকি যে নিজেও বহু পরিমাণে এই যুদ্ধের সঙ্গে